তারিখ 13 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

১০৪

৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ শিক্ষিতের হার যেখানে সর্বোচ্চ

।। গাজী রফিকুল ইসলাম ।।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। পাহাড় ঘেরা এলাকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী যুগ যুগ ধরে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশের এলাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন অবস্থানে কখনও ছিল না। তবে সেখানকার একটি স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে একথা সত্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ আমলে একটি জেলা হিসেবে থাকলেও এর শাসনব্যবস্থা ছিল খুবই ভিন্নতর। পাকিস্তান আমলেও সে ব্যবস্থার তেমন কোন রূপান্তর ঘটেনি। বর্তমানে অবশ্য একটি জেলা নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে–রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন। প্রতিটি জেলা সদরে দেশের অন্যান্য জেলার মতোই একজন ডেপুটি কমিশনার রয়েছেন।

বিশাল এলাকা এই পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে বসবাসরত উপজাতীয় অধিবাসীদের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা দশমিক পঁয়তাল্লিশ ভাগ মাত্র। পার্বত্য এলাকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জীবনধারা তাদেরকে কখনো দেশের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। তারা বাংলাদেশী নাগরিক। অপরাপর অধিবাসীদের মতো সব ক্ষেত্রে তারা কেবল সমান অধিকারই ভোগ করছেন না, এলাকাটির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বৃটিশ এবং পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের দিকটি দারুণভাবে অবহেলিত হয়েছে। এলাকাটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তখন তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। ফলে তখন ভৌত অবকাঠামো তেমন একটা গড়ে উঠতে পারেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠন করা হয়েছিল। '৯০ সালের জুন পর্যন্ত এই বোর্ড ৪০২ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং এলাকার সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই অর্থ ব্যয় করা হয়। উল্লেখ্যযোগ্য যে, উন্নয়ন খাতে এই বিপুল বরাদ্দ ও ব্যয় তুলনামূলকভাবে দেশের যে কোন অঞ্চলের ব্যয় বরাদ্দের চাইতে অনেক বেশি। এর ফলে অবশ্য পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলাই সমতল এলাকায় জেলাগুলোর অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হতে পেরেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে পার্বত্য এলাকা মোটেই পিছিয়ে নেই তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। উপজাতীয়দের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে চাকমা সম্প্রদায়। মোট উপজাতীয়দের অর্ধেকেরও বেশি হচ্ছে চাকমা। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার হচ্ছে শতকরা ৫২ জন। শিক্ষিতের এই হার সমগ্র দেশের শিক্ষিতের হারের চেয়ে অনেক বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৫৫৯৭১ মিলিয়ন টাকা কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়েছে। শিক্ষা উন্নয়ন খাতে মোট ১৮২টি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে ১৬৬টি কর্মসূচী ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়েছে। 'ইউনিসেফের' আর্থিক অনুদানে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কর্মসূচীর কাজ চলছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন উপজাতীয় ছেলেমেয়েদের জন্য চারটি আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন। দুটো বিদ্যালয় এরই মাঝে চালু হয়ে গিয়েছে। এর একটিতে ১৯০ জন এবং অপরটিতে ৯৭ জন উপজাতীয় ছেলেমেয়ে পড়াশুনা করেছে। কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত অপর দু'টি বিদ্যালয়েরে নির্মাণকাজ এখনও চলছে। এছাড়া 'ইউনিসেফ' শিক্ষা উপকরণ, খেলাধুলার বিভিন্ন সরঞ্জাম এলাকার বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করছে। উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, ওষুধ বিতরণও এই কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন স্কুল কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধিবাসীদের জন্য দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশেষ কোটার প্রবর্তন করা হয়েছে। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা প্রকৌশল এবং কৃষি কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষায় যে সব নিয়ম কানুন রয়েছে, উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য তা বহলাংশেই শিথিল করা হয়েছে। এই শিথিল নিয়ম কানুন চালু করার ফলে দেখা গেছে যে অনেক উপজাতীয় ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চিকিৎসা ও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে।